ছেলেবেলার ঈদ

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

সাহিত্যের গভীরতায় আমি যেতে পারিনি কোনো দিন। এখনো না। একটি গল্প লিখতে গেলে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। কল্পনার প্রখরতা একদকম নেই। তাই সমসাময়িক কোন ঘটনা বা ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকেই আমার লিখায় নিয়ে আসার চেষ্টা করি।

ঈদের স্মৃতি চারন করতে গিয়ে সেই ছোট্ট বেলার ঈদ গুলোকেই মনে পড়ে বার বার। খুব মিস করি সেই দিন গুলো। আবেগে হৃদয় স্পন্দন থেমে আসে বারবার। চোখের জল থামাতে পারি না কোনোভাবে। আজ ঈদের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে শিশু,কৈশোরের ঈদ গুলোকেই শ্রেষ্ঠ ঈদ মনে হয় আমার কাছে। যখন বড় হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পদচারনা শুরু হলো, শৈশব ও কিশোরের ঈদের আবেদনগুলো যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে লাগলো মন থেকে। আর এখন..... ।
আমার জন্ম ঢাকাতে। ঢাকার বাসাবোতে। বাসাবো এলাকাটি বর্তমান সবুজবাগ থানার অন্তর্গত। বাবা ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উধ্বতন কর্মকর্তা। আর আমি ছিলাম বাবা – মায়ের খুব আদুরের বড় সন্তান।
রোজার শুরুতেই বাসায় ঈদের আমেজ শুরু হয়ে যেতো। মায়ের কাছে থাকতো আবদার আমাকে পছন্দের প্যান্ট, শার্ট, জুতো কিনে দিতে হবে। স্কুলের বন্ধুদের ভিতরো অন্য রকম একটা আমেজ। সবাই বাবা মায়ের কাছে করতো একই আবদার। মহল্লার প্রতিবেশী বন্ধুরা প্রতিদিন বিকেলে জড়ো হতাম কে কি কিনলো জানতে বা কে কি কিনবে জানতে। কেউ রেডিমেট দোকান থেকে প্যান্ট,শার্ট, কেউবা বাবার সাথে দর্জির দোকানে গিয়ে শার্ট প্যান্টের মাপ জেনে পছন্দের কাপড়টি কিনে আনতো। জুতো কিনতে চলে যেতাম আলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট কিংবা রমনা ভবনে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো, ঈদের পোষাক কিনেই লুকিয়ে রাখতাম কেউ যেন দেখে না ফেলে। দেখে ফেললে পুরনো হয়ে যাবে, ঈদের দিন আর বন্ধুদের সারপ্রাইজ দেয়া যাবে না। কাপড় কিনে দর্জির কাছ থেকে কাপড়ের একটু অংশ কেটে রাখতাম। টুকরো গুলো খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতাম যাতে বন্ধুরা দেখে না ফেলে।

ঈদ উপলক্ষ্যে কিছুদিন বেশ ঘুরা হতো মার্কেটে মার্কেটে। এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট, গাউছিয়া মার্কেট, রমনা ভবন, মৌচাক মার্কেট, বাদ যেতো না কোনটাই। বাবা সময় পেতেন না বলে, মাকে নিয়েই মার্কেটিংয়ে যেতে হতো। ঈদের দিন যতই এগিয়ে আসতো - মার্কেটে, রাস্তা ঘাটে মানুষের ভিড় ততই বাড়তে থাকতো। চারিদিকে খুশির আমেজ। মার্কেটে নতুন নতুন পোষাকের সমারোহ। আমার খুব ভাল লাগতো ভিড়ের চাপাচাপিতে মার্কেটে ঘুরে বেড়াতে। মা বাইরে বেরুনোর আগে সাবধান করে দিতেন যেন ভিড়ের ভিতর মায়ের হাত না ছাড়ি, এদিক ওদিক ছুটা ছুটি না করি। ঈদের সময় ছেলেধরারা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়ায়। ওরা দুষ্টু ছেলেদের ধরে রক্ত নিয়ে যায়। রক্ত চোষার ভয়ে মায়ের হাত একদম ছাড়তাম না আমি। তবে মার্কিটিংয়ের এক ফাকে স্ন্যাক্সের দোকানে যেতে ভুলতাম না কোনো দিনও। প্যাটিস, পেষ্ট্রি আর লাচ্ছি ছিলো আমার প্রিয় খাবার। বায়তুল মোকারামের হাতে বানানো লাচ্ছি একসময় আমার খুবই প্রিয় ছিলো।

ঈদের কেনাকাটা করে বাসায় ফিরতে খুব ভাল লাগতো। সহপাঠি বন্ধুদের কথাও মনে পড়তো, ওরা কে কি কিনলো। ফেরার পথে মাকে বলে দিতাম, মা এটা এমন জায়গায় রাখবা যাতে কেউ দেখে না ফেলে।

ঈদের আগের দিন খুব মজা হতো। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ির ছাদে চলে যেতাম দল বেধে ঈদের চাঁদ দেখবো বলে। চাঁদ দেখা মাত্রই সারা মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যেতো। ছাদে দাঁড়িয়ে ঈদের চাঁদ দেখতাম। কাল ঈদ। ঘরে এসে

টি.ভি অন করে দিতাম। ততক্ষনে ঈদের গান শুরু হয়ে গেছে টি.ভিতে। বাবা অপেক্ষা করতেন টি.ভি নিউজের জন্য। অনেক সময় ঈদের চাঁদ ঈদের চাঁদ দেখা যেতো না। খুব টেনশন লাগতো তখন। কাল বুঝি ঈঁদ হচ্ছে না। অপেক্ষা করতে হতো রেডিও টি.ভির ঘোষনার জন্য। সেদিন খুব মনযোগ দিয়ে শুনতাম রেডিও, টি.ভি নিউজ।
আমার বাবা প্রায় সময় বায়তুল মোকারাম মসজিদে ঈদের নামাজ পড়তেন। মাঝে মধ্যে জ়াতীয় ঈঁদগাহে। আমিও বাবার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে যেতাম। ঈদের দিন সকালে ৫টা – ৬টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে যেতাম। মা আগে থেকেই গরম পানির ব্যাবস্থা করে রাখতো। গোসল সেরে পাঞ্জাবি, জিন্সের প্যান্ট আর টুপি পড়ে নিতাম। মা শরীরে আতর লাগিয়ে দিতো। এর পর মিষ্টি মুখ করে যায়নামাজ নিয়ে বাবার সাথে ছুটতাম নামাজ পড়তে।

ঢাকা শহরের ঈদের সকালটি অন্য রকম লাগতো আমার কাছে। ঈদের দুদিন আগ থেকেই শহরের লোকচলাচল কমে যেতো। অনেকে গ্রামের বাড়িতে যেতেন ঈদ করতে। ঈদের ছুটি পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার এই একটা সুযোগ। এ সময় ঢাকাকে এক নিরব নগরী মনে হয় আমার কাছে। খুবই ছিমছাম, থাকে না কোনো যানজট, কোনো কোলাহল। খাবারের রেষ্টূরেন্ট গুলো ছাড়া অন্য সব মার্কেট,দোকান পাট বন্ধ থাকে কয়েকদিন। ঢাকাবাসীর ঈদ বিনোদনের বেশ ব্যাবস্থা আছে। শিশু,কিশোর,যুবকরা দলবলে ছুটে যায় চিড়িয়াখানা, শিশু পার্ক, সরোওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ ভবন, রমনা পার্ক বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এছাড়া বাসাবো ,মিরপুর, কমলাপুর, মালিবাগ ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী মেলা বসে এই সময়টায়।

জ়াতীয় ক্রীড়া পরিষধের গেট দিয়েই বায়তুল মোকারমে প্রবেশ করতাম আমরা। উল্লেখ্য,পরবর্তীকালে জ়াতীয় ক্রীড়া পরিষদ আমার জীবনের একটি অংশ হয়ে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমি খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ে খেলাধুলা করেছি। তাই ক্রীড়া পরিষদে আসা যাওয়া ছিলো নিয়মিত। এক সময় বেশ আড্ডাও হতো ক্রীড়া পরিষদে।

নামাজ শেষ করে প্রথমে বাবার সাথে কোলাকোলি করতাম।খারাপ লাগতো রাস্তায় হাত পা কাটা পঙ্গু ভিক্ষুকদের দেখে। মনে হতো ওরা যদি আমাদের মতো ঈদ করতে পারতো তাহলে কতই না মজা হতো। ফেরার পথে বাবা আমাকে বেলুন কিনে দিতেন। বাসায় ফিরেই মাকে সালাম করতাম। মা সালামি দিতেন।
এরই মধ্যে পাড়ার বন্ধুরাও বাসায় হাজির হতো। সবার পরনে নতুন নতুন রংবেরংয়ের শার্ট, প্যান্ট, জুতো। মা সবাইকে খাবার পরিবেশন করতেন। বন্ধুরা সবাই মিলে বেরিয়ে পরতাম বেড়াতে। ঈদের দিন প্রায় সব বন্ধুর সাথেই দেখা হতো। আড্ডা, হৈচৈ করেই দিনটি কাটিয়ে দিতাম আমরা।
বন্ধুরা ঈদের দিনই প্লান করতাম পরের দিন কি করবো কোথায় যাবো। শিশু পার্ক, মিরপুর চিড়িয়াখানা নাকি নাকি অন্য কোথাও।
সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরতাম। বাবার কোন বন্ধু বা প্রতিবেশী কোন খালাম্মা বেড়াতে এসেছেন। মা – বাবা আতিথেওতায় ব্যাস্ত। আমি চুপ করে টি.ভির সামনে গিয়ে বসতাম। ভাবনায় চলে যেতাম অনেক দূর।

প্যারিস
Polashsl@yahoo.fr